KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২এ/এ কালী দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা-৫ (1/1 and 2) 19 Panditia Terrace, cal 29 (1/4 and 2/2)
Collection : KLMLGK	Publisher : Debkumar Bose (2/2) অমৃত কুমার (1/1 and 2) Sajal Banerjee, (1/4)
Title : অনুভব (ANUBHV)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 1/1 1/2 1/4 2/2 (SL. NO. 6)	Year of Publication : 1966 জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ March 1967 কার্তিক ১৩৭৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : গৌরাঙ্গ ভৌমিক	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অনুভব

গৌরাঙ্গ ভৌমিক
সম্পাদিত

কবিতার ত্রৈমাসিক বর্ষ ১ সংখ্যা ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩

অনুভব-প্রসঙ্গ

অনুভব আধুনিক বাঙলা কবিতার ত্রৈমাসিক সঙ্কলন।
দলমতনির্বিশেষে সকলের লেখাই গ্রহণ করা হয়।
কেবল কবিতা ও কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ ছাপা হয়।
অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।
বৎসরে চারটে সংখ্যা প্রকাশিত হয়
যথাক্রমে ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ্য, ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ মাসে।
প্রতি সংখ্যার দাম ৩০ পয়সা, বার্ষিক সডাক ১'৫০ টাকা।
নমুনা সংখ্যার জন্য দশ পয়সার চারটে ডাকটিকিট পাঠাতে হয়।
রচনা সম্পর্কে কোনো মতামত পূর্বাহ্নে জানানো হয় না,
এমন কি নির্বাচিত রচনা কোনো বিশেষ কারণে
পরবর্তী সংখ্যায় মুদ্রিত হতে পারে।
প্রকাশিত রচনার জন্য সম্পাদকমণ্ডলী কোন
দায়দায়িত্ব স্বীকার করেন না।
প্রত্যেক সৎ কবি ও সৎপাঠকের সহযোগিতা
অনুভব চিরদিন কামনা করে।
পত্রোত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে থাকা বাঞ্ছনীয়।

তিরিশ ও তিরিশোত্তর বাঙলা কবিতার ইতিহাস

চারটে সুদীর্ঘ অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থ রচনার সঙ্গে বাঙলাদেশের বহু সমালোচক ও কবি জড়িত আছেন। উক্ত কালের কবি ও কবিতার নিপুণ বিশ্লেষণের সঙ্গে যুগ চরিত্র ও তার বৈশিষ্ট্য আলোচিত হবে। এই সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের একটি সুদীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জীও এই পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হবে।

(যন্ত্রস্থ)

অ্যাকাডেমিকা ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-১২

অনুভব

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

আধুনিক বাংলা কবিতার ত্রৈমাসিক সঙ্কলন
বর্ষ ১ সংখ্যা ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩

সম্পাদক | গৌরাঙ্গ ভৌমিক

সহকারী : জয়ন্তকুমার, অরুণকুমার দে হাজরা, দেবকুমার বসু, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত রায়, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যার।

পৃষ্ঠপোষক : দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যার মীরাটলাল. ধনঞ্জয় দাশ

সাম্প্রতিক কবিতার বিপক্ষে | অগ্নিময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিককালে বাঙলা কবিতার চেহারা ও চরিত্র পালটেছে, অন্ততঃ পোষাকে-আষাকে নতুন যুগের রঙ ধরা পড়েছে—তা চক্ষুষ্মানমাত্রই স্বীকার করবেন। তার শত্রু যেমন আছে, তেমনি মিত্রের সংখ্যাও কম নয়। কেউ তার প্রেমে রাস্তার কিংবা কফি হাউসের ধূলো মাখছেন, কেউ বা অহেতুক নিন্দায় ড্রইংরুমের বাতাসকে অন্যায়ভাবে উত্তেজিত করছেন। স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে; সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতা প্রাক্তন ধারার স্বীকৃত, রুষ্ট ও প্রবল প্রতিপক্ষ। নতুবা নিন্দা বা প্রশংসায় বিভিন্ন মহল একটা আলোড়িত হবে কেন ?

আমরা যেহেতু কবিতার স্বপক্ষের লোক, কারো কারো কাছে আসামী পক্ষের সাক্ষী ও আত্মীয়, সেজন্যে আত্মপ্রশংসার কথাগুলি আর উচ্চারণ করবো না। বরং নিজেদের দুর্বলতাগুলোর কথা বলতে বলতে লজ্জিত, দুঃখিত ও শুদ্ধ হওয়ার কথাই চিন্তা করবো।

খুব বেশীদিন আগের কথা নয়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিহারীলাল চক্রবর্তী নামক জনৈক কবি কবিতার পুরোনো ঘরে ভাঙন ধরিয়ে সরস্বতীকে প্রেয়সী কল্পনা করেছিলেন, এবং বিষন্ন বিদ্রোহের এক অদৃশ্য কম্পনে নিজের

অভিভূত চিন্তাকে প্রসারিত করেছিলেন। তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই অশান্তীয় প্রেরণায় তিনিও প্রায় সারাটা জীবন অস্থির পদচারণার শব্দে বাঙলা সাহিত্যকে সতর্ক, ব্যাকুল, ও সংশয়ান্বিত করে গেছেন।

আমরা সেযুগ ছাড়িয়ে এসেছি। তিরিশের কবিরা বাঁধন ছেঁড়ার কাজে বিদেশী পানীয় সম্বল করেছিলেন। আমরা এই তিরিশোত্তর সাহিত্যের বিদ্রোহী সন্তান, দেশীবিদেশী পানীয় নির্বিচারে পান করে নির্বিকার বিদ্রোহের নিশান হাতে তুলে নিয়েছি। নিজের কথা ছাড়া অপরের কথা আর বলব না—এমন একটা অদৃশ্য সঙ্কল্পকে মনে মনে ধারণ করে—একটা সাদা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়েছি, তাতে নিজের মুখচ্ছবি স্পষ্ট ফোটেনি—তবু তার রেখাগুলি পড়ার প্রাণপণ চেষ্টাই আমরা নিরন্তর করে যাচ্ছি। যতই কাছে যাই, কোন মুখ আর সঠিক আকারে ধরা দিতে চায় না। ঈশ্বরের জিভের মতো একটা লাল আগুনের ছায়া আমাদের মুখচ্ছবিগুলিকে চেটেপুটে নিষ্প্রভ করে দিচ্ছে। এই নিষ্প্রভতার অস্থিরতায় আমাদের নিঃসঙ্গ পদচারণার সংবাদ উচ্চারিত। ফলতঃ কোন চৈতন্যের শুদ্ধতায় কেউ পৌঁছতে পারছি না।

সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সর্বনাশা আত্মহননের পথ আমরা কেন বেছে নিলাম? সাম্প্রতিককালের হাওয়াটা তো কোনো একদিনে অতর্কিতে ঘণ্টা বাজিয়ে ধূসর হয়ে যায়নি। তারও তো নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, আর কারণ থাকলে প্রতিকারও আছে। এমন অবস্থাটা যে কাম্য নয়, তাতো নির্মমভাবে উপলব্ধ সত্য—একাধিক কবির কণ্ঠে সেই উপলব্ধির চকিত প্রকাশও কখনো কখনো লক্ষ্য করেছি। অথচ প্রতিকারের সন্ধানে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। ইতিহাসের বাঘা বাঘা মানুষগুলি কৃত্রিম আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে গিয়ে যখন কালের নির্মম পেষণে পিষ্ট হয়ে গেলেন, তখন স্বভাবতঃই মনে হয়, সাম্প্রতিক-কালের এই অবক্ষয়িত অস্থিরতাটাও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তবু, আজকের ব্যাপারটা দুঃখজনক।

আসলে, স্বাধীন চিন্তার নাম করে আমরা যে ধার করা ফর্মুলাটা জীবনের ওপর চাপাবার চেষ্টা করছি, সেটা এখনও সর্বাংশে সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। বরং তাতে পরবশ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাকেই প্রাধান্য দিয়েছি। কবিতা চিরদিনই বিদ্রোহ ও নিয়মভঙ্গের মধ্য দিয়ে নতুন পথের সন্ধান

করেছে। সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতা সেই spirit নিয়ে পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে পারছে না। স্ব-ভাবে আচ্ছন্ন কবির সংখ্যা বর্তমানে বিরল। প্রায় সকল তরুণ কবিই যেন কুমোরটুলির ছাঁচে ঢালাই প্রতিমা নির্মাণের দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। ফলতঃ তাঁদের স্বাধীন চিন্তার ধুয়াটা আন্তরিকতার চাইতে অধিকতর প্রচারমুখী হয়ে উঠেছে। উদাসীনতাটাও একপ্রকার মুখোস। আমরা সেই মুখোসের সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হবার চেষ্টাই করেছি, সত্যিকার মুখচ্ছবি দেখবার কোন সজ্ঞান চেষ্টা করিনি।

তিরিশের যুগে প্রেমেন্দ্র মিত্র, নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতির পাশাপাশি জীবনানন্দের সম্মোহিত কবিতাবলী কাব্য পাঠককে চমৎকৃত ও বিস্মিত করেছে। মানুষের মন বৈচিত্র্য চায়, তার ধ্যানধারনা, চলাফেরা কেবল রাজপথ দিয়ে চলে না—প্রয়োজনবোধে গলিঘুজিতেও রূপকথার সোনালী আপেলগুলির খোঁজে যেতে হয়। নিতান্ত আত্মভাবের প্রেরণায় কবিতা রচনা সম্ভব হলেও সকল কবিই কোনো একটি নির্দিষ্ট আবেগের স্রোতে গা ঢেলে দেবেন—এমন কি চুক্তি আছে? বহু প্রধান ও অপ্রধান নদীর নিরন্তর স্রোতোধারায় মহাসাগরের প্রসারিত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। জলভাগের মতো স্থলভাগটাও একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় সারা পৃথিবীটা সমুদ্র গহ্বরে নিমজ্জিত হতো। নদীগুলির অস্তিত্ব স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই সমুদ্রের বিশালতা প্রমাণিত হতে পারে, নতুবা সেতো বৃহৎ জলাশয়। জলাশয়ের বদ্ধতা চিরদিনই পীড়াদায়ক। আমরা সেই পীড়াদায়ক অসুস্থতাকে শরীরে ধারণ করে লজ্জিত হয়ে আছি।

সাম্প্রতিককালে প্রচারিত কবি-মনোভাবের সঙ্গে অপরিচিত থেকেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রাম বসু, মণীন্দ্র রায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি চল্লিশের কবিরা সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্য রচনা করে স্থায়ী স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। আজকের কবিদের আমি তাদের পথ অনুসরণ করবার পরামর্শ দিচ্ছি না। কোনো সুনির্দিষ্ট মতবাদ থাক আর না থাক—কবি যদি তাঁর স্ব-ভাবের প্রতি আন্তরিক হন তবে তা পাঠক মনকেও স্পর্শ না করে পারে না। আজকের সংশয় ও সন্দেহ এই আন্তরিকতার অভাবজনিত। বলা যায়, এটা কবিতার আকালের যুগ। মাঠে বীজ বোনা হয়েছে, হরিৎ-শস্যের অংকুরে মাঠের চেহারাটাও এবপ্রকার দেখতে মন্দ লাগে না, কিন্তু

ফুল থেকে আর প্রত্যাশিত ফলের বীজ মাটির বুকে ঝরে পড়ছে না। অপুষ্টি-জনিত উৎকণ্ঠায় ও কৃত্রিমতায় মাঠের বুকে অপরিণত ফসলের নিরন্তর ক্রন্দনই তাই আমরা শুনতে পাই।

সাম্প্রতিককালের বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আবহমণ্ডল নানা কারণে উত্তপ্ত ও উত্তেজিত। অথচ,আমরা এ দশকের কবিরা সেই উত্তাপে যথেষ্ট উত্তেজনা বোধ করছি না। কতগুলি মানুষ, কতকগুলি তরুণ-প্রাণ অকালে বিনষ্ট হয়ে গেল—সংবাদপত্রের শিরোণামা দেখে আমরা বারবার চমকে উঠেছি—কিন্তু সেই চমকের কাব্যরূপ প্রকাশে দ্বিধান্বিত হয়েছি। অথচ, যে কোন একজন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যুতে আমাদের শোকার্ত-কলম কত দুঃখের কথাই না মাঝে মাঝে অশ্রুপতনের শব্দে উচ্চারণ করে। তা হলে কি আমরা একটি সিদ্ধান্তে এসেছি, একজন মহান দেশনায়ক কিংবা প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু কয়েকহাজার তরুণপ্রাণের রক্তদানের বিষম পরিণতির চাইতেও শোকাবহ ঘটনা ?

আসলে আমরা এইসব মুহূর্তগুলিতে স্থিতধী হওয়ার চাতুর্যপূর্ণ শিল্প কৌশল টিকে আয়ত্ব করবার চূড়ান্ত পাঠটি সসম্মানে অধ্যয়ন করেছি। কারণ বুদ্ধিমান রাজনীতিকের মতই আমরা একটি মোক্ষম কথা জেনেছি, কোনো সাময়িক উত্তেজনাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। সমস্তরে এই উত্তেজনা প্রায়শঃই বিড়ম্বনার কারণ হয়। চতুর ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো আমরা তাই, কালের হাওয়ায় মুখ রেখে চোখ বুজেছি, পাশ ফিরে শুয়েছি, কান খাড়া রেখেছি—কিন্তু সাড়া দিইনি। সেজন্যেই আমরা মনগড়া একটা থিয়োরীকে দাঁড় করিয়েছি; কবির সমাজ নেই, সংসার নেই—নির্জন হাওয়ার নীল বিষণ্ণ-তাই আমাদের কবিপ্রাণকে ঘুমপাড়ানি গানের সুরে ঘুম পাড়ায় কিংবা ঘুমতাড়ানি ছড়ার মতো চোখের কোণে বিনিদ্রতার কাজল পরায়।

লক্ষ্য করেছি, একটা অদৃশ্য রোষ, ক্ষোভ, বিষাদ আর অপ্রমত্তার নাবালক সন্তান আমাদের ঘরের ভেতর সর্বদাই হামাগুড়ি দিয়ে পিতা-পিতামহের মুখের ওপর দশ আঙুলের নখ দিয়ে আঁচড় কাটছে। আর আমরা একটা অপুষ্ট যন্ত্রণা ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ধূসরতার ঘ্রাণ টেনে নিয়ে যুগের ওপর দায়দায়িত্ব অর্পন করেছি। এ যেন অনেকটা শামুকের মতো লম্বা শুঁড় দিয়ে ছুনিয়াটাকে ছোঁয়ার এক দুঃসহ চেষ্টা। খোলসটার ওপর আমা-দের ভারী মায়া। সেই মায়াতেই আমরা সম্মোহিতের কাব্য রচনা করে

যাচ্ছি। এই সর্বনাশা আত্মঘাতকের মনোভাব কেমন করে আমাদের চিন্তা ও চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে নিরন্তর এক অন্ধকার গিরিখাতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং কেমন করে সমাজবিমুখতার কল্পিত আদর্শের জগতে আমাদের দ্রুতহাতে ঠেলে দিচ্ছে—তা বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণিত সত্যে পৌছনো হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়। তবে বর্তমান আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে চেষ্টা অর্ধপ্রকাশ্য যন্ত্রণার সামিল হবার সমূহ সম্ভাবনা। আমরা মুক্তচিন্তায় স্বপক্ষে যে ধূসর বিজ্ঞাপনটি সর্বত্র বিলি বেড়াচ্ছি, তা আসলে আর একটি অদৃশ্য খাঁচার খোলাপথের কথাই টিয়ে পাখির কণ্ঠে প্রচার করছে। স্বাধীনচিন্তার একান্ত ব্যক্তিগত উন্নয়ন ধোঁয়ায় আমরা আমাদের ঘর অন্ধকার করে এনেছি, এবার বুকে যক্ষা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ ফুসফুসটা তো আর Stainless Steel দিয়ে তৈরী নয়—এরও ব্যামো হতে পারে।

কেউ কেউ বলেন, (তাঁরা নিশ্চয়ই নিন্দুক) সাম্প্রতিক কবিতার মাত্রা-তিরিক্ত যৌনাবেদন এই অসুস্থতারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। নিম্নাঙ্গের যন্ত্রনাটা সেই আদিমকাল থেকে মানুষকে পীড়িত ব্যথিত করে আসছে, এবং আমা-দের প্রাজ্ঞ-পিতামহগণ সেইজন্যেই সংযমের lessonটা পাঠ করে নিতে সকল সন্তানকেই উপদেশ দিয়েছিলেন। আমরা পিতামহদের অস্বীকার করেছি, সেইসঙ্গে তাঁদের উপদেশগুলিও। এবং একটা কথা বুঝেছি, নিষিদ্ধ বস্তুর ওপর মানুষ যতই ক্রুদ্ধ মন্তব্য করুক—তবু সেসব বস্তুর ওপর সকল মানুষেরই একটা অবৈধ ঔৎসুক্য আছে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করে থাকবেন, আমরা রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের বটতলা মার্কা বইগুলির নিন্দা করি, কিন্তু বাজারে তাদের চাহিদা যে কোনো সদগ্রন্থের অন্ততঃ দশগুণ। আধুনিক কবিতার যৌনাবেদনের অশ্লীলতামুখী চৈতন্যের আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তা ঠিক সেই কারণে। পাঠক ইচ্ছে করলে, পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন দেখে স্বপ্নাক্ত মাদুলির সন্ধানে কোনো কোনো সাম্প্রতিক কবির দুয়ারে ধর্ণা দিতে পারেন। আমরা তাদের নিয়ে ভয় করিনা, আশঙ্কা শক্তিমানদের মতিচ্ছন্নতা নিয়ে।

সাম্প্রতিককালে বাঙলাদেশে যে রক্তক্ষয়ী ঘটনাটা ঘটে গেল, তার জন্যে স্পষ্টক্ষোভ কবিপ্রাণেও সঞ্চারিত হওয়া উচিত ছিল। এই অবস্থার জন্য কে দায়ী—সেকথা চিহ্নিত করা কবির কাজ নয়। তাঁকে রাজনৈতিক বিবৃতি দেবার সুপারিশ অন্ততঃ আমার নেই। তথাপি ক্ষোভটা সত্য, আলোড়নের

দ্বারা নির্মমভাবে উচ্চারিত ও প্রমাণিত। কোনো সজীব মানুষ, সব কিছুকে স্বচক্ষে দেখেও যদি নির্বিকার থাকেন—তবে ডাক্তারী পরীক্ষার দ্বারা তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পরীক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের সাম্প্রতিক কবিকুল অন্যান্য সামাজিক মানুষের মতই নাকি দৈহিক অস্তিত্বের অধিকারী। অথচ তাঁদের মনটা বেখাপ্পা বেঢপ রকমে বহিরাগত মালমসলায় একখণ্ড জেলিপিণ্ডের মতো তুলতুল করছে। নতুবা সর্বক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহস দেখিয়ে স্বদেশের গণ্ডীতে তারা এতটা শামুকের স্বভাব ধারণ করেন কি করে?

কেউ কেউ বলেন, চল্লিশের যুগের কবিরা যে সামাজিক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যরচনা করেছেন—তা আর কিছুতেই কবিতার বিষয় হয়ে উঠতে পারে না। কারণ, কবি সমাজ নিরপেক্ষ এক স্বাধীন মানসিকতার অধিকারী। আশ্চর্যের বিষয় এখানেই। কেননা, ব্যক্তিগত সৌজন্যবোধ ও বাহ্যিক রুচিপ্রবৃত্তির বিচারে এই মনোভাবের কবিও স্থূল এবং সূক্ষ্মমর্থে একান্তভাবেই সামাজিক জীব। প্রাত্যহিক জীবনের সুখেদুঃখে তিনিও প্রায়শঃই বিচলিত।

কবিতার বিষয় কি হবে, তা পূর্বাহ্নে নির্দেশ করা হয়তো অসম্ভব। কিন্তু বাইরের ঘটনাবলী যদি কবির অন্তরকে সৃষ্টিশীল যন্ত্রণায় উত্তেজিত করে—তবে সার্থক রূপ ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে তাও যথার্থ কাব্য হয়ে উঠতে পারে। বরং বিশ্বাসের ও হৃদয়ের প্রতি অনুগত থেকে যে কোন ঘটনাই কবি প্রকাশ করুন না কেন—তাই পাঠক মনকে আকৃষ্ট করবে। অথচ আমরা পঞ্চাশ ও ষাটের কবিরা, যথেষ্ট বহিরাগত চিন্তাকে কাব্যরূপ দিয়েও কিছুতেই সমাজকে অন্তরে ধারণ করতে পারিনি।

আসলে, এই আত্মঘাতী মনোভাবের পশ্চাতে কবির মনে কোথায় যেন একটা প্রচণ্ড ভয়, অভিমান, ক্ষোভ ও দুঃখ লুকিয়ে আছে। অচিরাৎ এর প্রতিকার না ঘটলে আজকের কৃত্রিম অভ্যাসটা ভবিষ্যতে স্বভাবে পরিণত হবে।

এমন একদিন আসবে, যখন আমরা আমাদের এই অভ্যাসের জামাটা ছিঁড়ে ফেলতে চাইবো, সেদিন আমাদের কষ্টার্জিত মুখের কাঠামোটা বিদীর্ণ চীৎকারে ফেটে যাবে। বহু অশ্রুপাত ও রক্তের তর্পণে একদিন আমরা নিশ্চয়ই শুদ্ধ হবো।

বর্তমানের মুখোসটা কিছুতেই একমাত্র সত্য হতে পারে না। সেই ভবিষ্যতের আশাতেই কেবল বর্তমানের দুঃখটা ভোলবার চেষ্টা করছি। পত্র-পত্রিকার সূচীপত্রে এতো পুরুষ কবির নাম দেখি অথচ কবিতাপাঠে তা একেবারেই মনে হয় না। বাঙলাদেশের জোলো হাওয়ায় এতো পৌরুষহীন মাদকতা ছিল—তা আগে কে জানতো? *

* সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতার প্রধান ধারাটির প্রতি লক্ষ্য করেই প্রবন্ধটি রচিত। এমন কি, মন্তব্যগুলির লক্ষ্য ব্যক্তিগতভাবে কোনো কবি নন, সামগ্রিকভাবে একটি প্রবণতাকেই আমি লক্ষ্য করেছি। ফলতঃ কারো কারো সম্পর্কে মন্তব্যগুলি সঠিক না হবার অধিক সম্ভাবনা।—লেখক।

মঞ্জুলিকা দাশের স্মৃতি | অমিতাভ দাশগুপ্ত

১৯৫৭ সাল। শীর্ণ, ভীরু চেহারার যে মেয়েটি আমাকে পিছন থেকে ডাকল, তাকে আমি চিনতাম না। কেবল পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বাংলা ক্লাশে মেয়েদের সারিতে কখনো তার মুখ ভেসে উঠতে দেখেছি।

'বলুন'—তার দিকে সরাসরি তাকালাম। সামান্য ইতঃস্তত করে কুণ্ঠিত গলায় মেয়েটি বলল—'একটি কবিতা লিখেছি। ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজীনে ছাপানো যাবে'? 'ভালো লাগলে অবশ্যই যাবে'—নকল গলায় আশ্বাস দিয়ে লেখাটি নিলাম। বলা বাহুল্য, সেটি প্রকাশিত হয়নি। চার পাশে বন্ধু-কবিদের ভীড় বড্ড বেশী ছিল।

মেয়েটির নাম মঞ্জুলিকা দাশ। সুদূর জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় এম. এ. পড়তে এসেছিল। পরে ভালোভাবে আলাপ হয়েছিল বাংলা সেমিনারে, যেখানে উঁচু তারে বাঁধা কাঁপা কাঁপা গলায় সে তার কবিতা মাঝে মাঝে পড়ত। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে জীবিকার প্রয়োজনে যখন এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে মঞ্জুলিকার কবিতা কোন সাহিত্য-সাময়িকীতে চোখে পড়ত, আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। এবং বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতাম সবার অলক্ষ্যে কি ভাবে ওর লেখায় একটি নিজস্ব প্যাটার্ন তৈরী হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত মঞ্জুদের দেশ জলপাইগুড়িতেই কাজ নিয়ে আমাকে আসতে হল। তখন স্টেশন রোডে হোটেল ওএসিসে থাকি। একদিন খুব ভোরে

আমার ঘরের দরজায় কয়েকবার টোকা পড়ল। দরজা খুলতেই দেখি, বেগুনী কাডিগান গায়ে, একটি নীলচে মলাটের খাতা হাতে মঞ্জু দাঁড়িয়ে। ভীষণ খুশি হয়ে প্রায় হাত ধরে ওকে ঘরে এনে বসালাম। কিছু না। এটা সেটা কথাবার্তার পর একটু লাজুক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মঞ্জু ওর খাতাটা খুলে ধরল। আরো কিছুক্ষণ পরে আমরা দুজনেই স্থনের পুতুল হয়ে সেই নীলখাতার কবিতার জলে ডুবে গেলাম।

কিছুদিন পর টাকীতে মাস্টারী নিয়ে চলে গেল মঞ্জু। সেখান থেকে বলরামপুর। ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে ওর লেখা দেখেছি দেশ, আনন্দবাজার, উত্তরসূরী, ক্ষণ, দ্রুপদী, উত্তর-তরঙ্গ, পূর্বাশা ও নতুন পরিবেশে। গত ছয় বিভিন্ন শারদীয় সাহিত্য সঙ্কলনে ওর গল্প, কবিতা পড়লাম, ওকে রীতিমত সমপিত বলে মনে হল। মনে পড়ল 'বাংলা কবিতা'র দ্বিতীয় সঙ্কলনে ওর একটি কবিতা পড়ে আমরা অনেকে কেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম।

গত পূজোর ছুটিতে হঠাৎ মঞ্জুর সঙ্গে কফিহাউসের সিঁড়িতে দেখা। দুজনে যেয়ে, একটা চায়ের দোকানে বসলাম। চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে মঞ্জু বলল—'ভাবছি, স্কুলের চাকরী ছেড়ে দেব। তাছাড়া একটা উপন্যাস আর কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়ে গেছে, ছাপানোর ব্যবস্থা করতে চাই।

ডিসেম্বর মাসে শুনলাম ও সত্যিই স্কুলের চাকরী ছেড়ে কলকাতার একটি সাহিত্য-পত্রে কাজ নিয়েছে। মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম ও ভেবেছিলাম ওর কপালে অনেক দুঃখ আছে। সেই দুঃখ ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী শনিবার মধ্যরাত্রে ভয়ানকভাবে আমাদের দরজায় কড়া নেড়ে গেল। পি. জি. হাসপাতালে মঞ্জু ভর্তি হয়েছে···মঞ্জুর রক্তে শ্বেত কণিকারা দারুণ দ্রুততায় বংশ বৃদ্ধি করছে···ওর অপারেশন হয়েছে···একটু ভালোর দিকে···তারপর পিয়নের হাত থেকে পাওয়া সেই অমোঘ টেলিগ্রাম।

আমি জানতে চাইনা, কেন মঞ্জু একসন্ধ্যায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওর হাতের শিরা ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল। জানতে চাই না, নাগরিক-লেখকদের কাছ থেকে ও কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা পেয়েছিল। শুধু জানতে চাই, মঞ্জুলিকার উপন্যাস ও কাব্য-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করার সাহসী দায়িত্ব আমরা কে কতখানি কাঁধে তুলে নিতে পারব।

গোলাপ | মণীন্দ্র রায়

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্যে

আমি বহুদিন পরে
গোলাপ পেয়েছি হাতে—
এরকম অনুভূতি ;
চোখের আধ হাত দূরে
যেন কার আধোহাসি, যেন
নারীর ত্বকের মতো
কোমলতা, এরকম
চতুরা ঠোঁটের মতো স্ফুরিত বিন্যাস।

ওকি বাসর শয়ান ? প্রেম,
অবগাহনের হৃদয় যমুনা ?
নাকি মৃত্যু···ফোঁটা ফোঁটা
রক্ত ঢেলে কোন উন্মাদিনী
টানে সত্তা-উদ্‌ঘাটিত দিব্য হাড়িকাঠে !

মানুষ এবং আমি | মঞ্জুলিকা দাশ (১৯৩৫-৬৬)

বহুদিন রুক্ষক্লিষ্ট চুলের ভিতর তৈলহীনতার স্বাদ
পাই দীর্ঘ হাতে ছুঁয়ে। নিজের মলিন মুখ আর্তনাদে কেঁপে যেতে
আয়নায় দেখি। যেহেতু মানুষ
মানুষ নামের সব দর্প ভেঙে চুনকালি লাগিয়েছে মুখে,
সেই হেতু নিজ মুখ হৃদয়ের প্রতিভায়
দেখবো না লজ্জা বয়ে দর্পনে অঙ্কিত হতে দুঃখের আভাস।

মাঠের সবুজ শান্তি পা দিয়ে মাড়িয়ে গেছি,
দৃষ্টি তবু নষ্ট নয়, চোখের সান্নিধ্যে কোন সবুজ নেভেনা·····
একরাত্রি শয়নের আগে
ঘুমের ঔষধ রূপে তোমাকে দেখব রাত্রি—দেখে যেতে পারি

দেয়ালে নিজের ছায়া, কেননা সেখানে
কোন বিকৃতির চিহ্ন ফোটে নাই। দিনের আলোরা
বড় বেদনার ভয়াবহ খাঁড়ি।

মানুষেরই নাম ভাসে। নামহীন ভূমিকার রাত্রি যেন ছায়ার দর্পন।
দেখবো তোমাকে রাত্রি প্রার্থিত দ্রষ্টব্যরূপে দূর জানালায়—
জাহাজ-ডুবির আগে আমাকে বাঁচিও তুমি মগ্ন এলাকায়,
মানুষের নাম দিয়ে যাব মৃত্যুপূর্ব-শেষ প্রার্থনায়।

(মল্লিকা দাশ রচিত তাঁর শেষতম কবিতা। ওঁর ভাই বিশ্বনাথের **সৌজন্যে প্রাপ্ত।**)

কোন প্রেমিকের কাছ থেকে | রত্নেশ্বর হাজরা

আমি কাউকে ভালোবাসি না
হয়তো কেউ সেও আমাকে
ভালোবাসে
সূর্যাস্তে সিন্ধুসারসের গল্প করে
কাঁধ-ভাঙা পাথরের উপর গৃহনির্মাণের উৎসব
বসায়। অর্থাৎ
কেউ কেউ ভালোবাসায় বিশ্বাসী। **কেউ কেউ**
গৃহনির্মাণে—
অথচ ভালোবাসা এবং ভগ্নস্তূপের আন্তিক
পাশাপাশি বাস করে। রাতদিন
নদীর ধারে বসে থাকে। আমি
কাউকে ভালোবাসি না
হয়তো কেউ কেউ আমাকে
ভালোবাসে
সূর্যাস্তে সিন্ধুসারসের দ্বীপে
কাঁধ-ভাঙা পাথরের উপর
ভগ্নস্তূপে
গৃহনির্মাণের উৎসব বসায়।

টেপ রেকর্ডিং-এ হতবাক বিচ্ছেদের স্মৃতি : বার্লিন | কুশল মিত্র

বিচ্ছেদের রক্তাক্ত সন্ধ্যায় যখন যন্ত্রণাময়
মনে হয় সব শেষ, আলোহীন স্তব্ধ ঘরে বসে
কি কথা বলতে না পেরে বিচলিত অন্ধকার বুকে
কথারাও কাপুরুষ যেন চুপচাপ বসে থাকে—

ঠিক ভেজা বেড়ালের মত এ দেশের ফুটপাতে
বরফে জমাট বাঁধা সারি সারি গৃহহীন গাড়ি
মার্সেডেস, দামী ফোর্ড আর যেমনি স্টুটারেরা সব
শীতে স্তব্ধ, কথারাও তেমনি বোবা স্থির বসে থাকে

তার আশা যদি সে আবারো মুখ তুলে ধরে, চোখও।
তা হলে অন্ততঃ বুঝি ভীরু সে প্রেমিকও যন্ত্রণাময়
কথা বলতে পারে—ভোটপ্রার্থী বুদ্ধিভ্রষ্ট কোন রাষ্ট্র
নেতার মতই—তার হৃদয়ের ব্যথা অনুনয়
বিনয়, প্রস্তাব—যত হাজার ঢেউয়েরা কথা কয়
হৃদ্‌পিণ্ডে সমুদ্রের বেলায় যেন সে নারীর জন্যে।

বিচ্ছেদের প্রতিরোধে জাগে এক বিশাল পুরুষ
যতদূরে চোখ যায় জাহাজের মাস্তুলেরা ভাসে।

একদিন বরফেরা গলে
পোড়া পেট্রলের ধোঁয়া ছেড়ে
গাড়িগুলি পথে পথে ছুট দেয় প্লেগবাহী ইঁদুরের মত
জীবনে প্লেগের চিহ্ন, সভ্যতা হারায় ভালবাসা—
প্রকৃতির ভাষা
বোঝাপড়া শুধু আজ পশু ও যন্ত্রের।
ভেজা বেড়ালটা, সেও শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁত বের করে হাসে
দাবী তার জানায় চীৎকারে
আর এই বিদেশী ভাষার মত
নীল চোখ, লাল ঠোঁট সোনালী চুলের ঢেউ সব মিথ্যে মনে হয়

সব মিথ্যে—বিদায় চুম্বন এই বিদেশের ভাষা
"আউফ ভিদ্যার জেন" ("ফের দেখা হবে")
প্রেমও যেন বিদেশিনী বিদায়ের কালে।

শুধু এক বিশাল পুরুষ, আহত প্রেমিক আজো
রুদ্ধবাক, কাপুরুষ নির্বাক কথার জালে বন্দী
পড়ে থাকে নায়িকার চলে যাওয়া পথের প্রান্তরে—
রিক্ত এক পৃথিবীতে চেয়ে থাকে শূন্য দৃষ্টি মেলে
আর ভাবে এই বিচ্ছেদের প্রতিরোধে
আর কি সে বলতে পারত এত ভালবাসার পরেও।

গোপন প্রেমের চেয়ে গোপন এতদিন
টেপ রেকর্ডিং-এ তুলে রাখা উচ্ছল প্রেমের ভাষা
টিপলেই যন্ত্রটায় ঘরের কোনায় আজ যন্ত্রণায় কেঁদে কেঁদে বাজে।

একটি মালার জন্য | কৃষ্ণ ধর

মালাগুলি সে নিল না, বোধ হয় লাগছিল।
একদিন মালা পরার জন্য সে কবিতা
লিখেছিল—সদ্য ফোটা যুঁইফুলের মালা।
তার গন্ধে সারা শরীর ম' ম' করবে,
বাতাস দুলবে অস্থির হয়ে,
যেতে যেতে সবাই তাকাবে পিছন ফিরে;
এই ইচ্ছা ছিল।

আজ মালাগুলি যখন স্তূপ হয়ে বসে
পড়ছিল,
সে নিল না;
বোধ হয় লাগ ছিল।

মালা পরতে সে চেয়েছিল ঠিকই;
ভালবাসার মালা।

এই মালার খোঁজে সে রাগে লাল
আকাশকে উপেক্ষা করে
ঝড়ের খোঁজে বেরিয়েছিল,—
অগ্নি কোণের ঝড়।

ঝড়ের সঙ্গে খেলাচ্ছলে সে
তুই-তুকারি করে বেমালুম পাঞ্জা লড়ল;
সবাই বলল: সাবাস।
অন্যরা বলল: এত আস্পর্দ্ধা!

কুলুপ এঁটে বন্ধ করে রাখল তাকে
পাঁচ-মানুষ সমান গারদে;
বাঁধা-সিংহের মতো সে ভীষণ রেগে রেগে
পায়চারি করল।

সেই গারদ হার মেনেছিল;
বেরিয়ে এসে সে চলে গেল।
যেখানে নদী, যেখানে পাহাড়, যেখানে ভালবাসার উপত্যকা।

যেখানে মানুষ, তার অসামান্য মুহূর্ত্ত
আর তার বেওয়ারিস দিন—
অপেক্ষা করে, সেখানে।

সে আর পিছন ফিরে তাকাল না।
সেই অসামান্য ভালবাসার উত্তাপ
তাকে আবৃত্ত করল ভীষণ আসক্তিতে।
সেই দিনগুলির আর নাগাল পাওয়া গেল না।

এখন আর মালা দিয়ে কী হবে?
যারা মালা দিতে পারত তারা আসেনি,
যারা মালা দিতে চেয়েছিল তারা আসেনি,
আমাদের সব দিনগুলিই মাঠে মারা গেছে।

সেই নিহত দিনগুলির ওপর দাঁড়িয়ে আছে
আততায়ী অন্ধকার
ভীষণ অবিশ্বাসী আর হিংস্র চোখ নিয়ে।

আমরা মালা দিইনি
সেই দিনগুলির জন্য ভীষণ মন কেমন করছিল।

স্বদেশ | বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকারে দেখা যায় না
তবু
অনুভব করা যায়
চোখের জলের নদী প্রবাহিত
এইখানে।

পরিত্যক্ত মৃতদেহগুলি
হঠাৎ বাতাসে
কেঁপে ওঠে, আর
শূন্য বেহুলার ভেলা ভেসে যায়
নরকের দিকে, দারুণ দুর্ভিক্ষে
অসহায়।

যখন অঞ্জলিবদ্ধ দুহাত | পুষ্কর দাশগুপ্ত

আলোর চিকণ রেখা পাতার সবুজ রেশমে চিক্‌চিক্ করে নাচতে থাকে
এবং ধ্বনিগুলি একঝাঁক রুপোলি মাছের মতো ঘুরে বেড়ায়
যখন চকিতে অজস্র বেগুনি ফুল ফুটে উঠতে পারে বলেই দুহাত
প্রসারিত আর ঐ অঞ্জলিতে বিকেলবেলার আলো টলটল করছে
এবং কেউ কেউ বলে ওঠে আমি আরো আলো……

আর শেষ
না হতেই তার কথা কোমল সুতোর মতো জট পাকিয়ে সুরের
দীর্ঘ অস্পষ্টতায় জড়িয়ে যায়
এবং আচ্ছন্ন আরো আচ্ছন্ন
আলো-আঁধারের হলুদ উপচ্ছায়ায় আগুনের পাটল তৃষ্ণা
থেকে থেকে জ্বলে ওঠে
যখন অঞ্জলিবদ্ধ দুহাত আগ্রহে উন্মুখ

সেদিন | মৃণাল দত্ত

আমি তখন সমস্ত নিশিন্দাবন খুঁজেছিলাম
একটা কিছুর অন্বেষণে
একটা নাকি প্রজ্বলিত হীরা
এইখানেতে হারিয়েছিল
নিশিন্দাবন-ঝোপের আড়ে
যেখানে ঠিক এক পায়েতে ঠায় দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছিল
দেবদারু, তার ডালপালাদের
সাঙ্গোপাঙ্গো জড়ো ক'রে
হাজার রুক্ষ চৈত্রদিনের শেষে।

আমি তখন স্পষ্ট উচ্চারণের মতো নাম ধরে তোর
ডেকেছিলাম
ঠোঁটের ফাঁকে নিঃশ্বাস ছোঁড়ার মতন করে বলেছিলাম :
'জয়শ্রী তুই ছুটে গিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে
একটা কিছু কুড়িয়ে আন
যা আনবি তাই সোনা।
নিশীথ রাতের তারাজলা আকাশ থেকে একটা কিছু
হঠাৎ যেন ছিটকেছিল
প্রজ্বলিত হীরা।'

তখন যেন হিমের মতো চুপ করে তুই দাঁড়িয়েছিলি, ঠাণ্ডা শরীর
যেন আমার হাঁকাহাঁকি, ডাকা-ডাকি
সমস্তটাই বৃথা
সেদিনই তোর প্রথম যেন ছুঁয়েছিলাম গা।

পাহাড় বিভ্রম | শংকর দে

অনেকদিন হলো আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি—একই ভাবে
ছায়া ও কুয়াশা দূর
চোখে জ্বলে পাহাড় বিভ্রম—
তুমি পার হয়ে এলে নাকি ?
আপোষ লণ্ঠনে জ্বলা তাও কি সম্ভব ছিল দিনে, নয়
রাতের ভিতরে চোখ সামান্যই সজলে আতুর—
সে কি বাঁধা মনে মনে এমনই বাদলে ভাসা মেঘ।

অনেকদিন হলো আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, একই ভাবে
উদাস পুকুরে সন্ধ্যা একা একা মরেছে যে পথে
ধূলি নয়
কাতর নিঃশ্বাসে ফেরা সুখে নয়, আঁধার প্রকৃত
সেই জ্বলা
এত কাছে ছিলে তুমি এমনই জড়িয়ে, কেন ভুল ?

অন্তরালে | শান্তি লাহিড়ী

চল্ ঘরে ফিরে যাই, যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে গেছে।
এখন পোষাক খুলবে মিথ্যে-রাজা মিথ্যে-প্রধানিনী
যাকে একমাত্র দেখলি পুত্রশোকে অন্তিম দশায়
সে কেমন হেসে উঠবে, বলবে, কেমন স্বপ্ন দেখালাম তোকে ?

চল্ ঘরে ফিরে যাই, বরফ কুচির মত হিম
কন্‌কনে শাদা ভাতে নুন লঙ্কা অমৃত তৃপ্তিতে
গো-গ্রাসে সাবাড় করে ছিন্ন কাঁথা, বাঁশের চাটাই—
তবুও এখানে কেউ শোকাতুরা হেসে উঠবেনা।

এখনো বিকেল হলে | পরেশ মণ্ডল

এখনো বিকেল হলে
পরিচিত গাছের ছায়ায়
আমি যেন তার জন্যে বসে থাকি।

এখনো বিকেল হলে
অস্ফুট কণ্ঠের স্বর ভেসে আসে
দ্বিধা ভয় লজ্জা নিয়ে মায়াবী সময় কেটে যায়।

তারপর অন্ধকার
তারপর অনাহূত হতাশা সন্তাপ
আমি আজ কোথায় এলাম ?

এখনো বিকেল হলে
পরিচিত গাছের ছায়ায়
আমি যেন তার জন্যে বসে থাকি।

অন্বেষণ | মৃণাল বসু চৌধুরী

মেঠো পথ দিয়ে যেতে যেতে দূর শালবনে
যে পাখির কণ্ঠস্বরে
নিবিড় সন্ধ্যার ছায়া
বার্তাহীন সমস্ত সবুজে ঘুরে ঘুরে যে আলোয়
স্বরলিপি অস্ফুট দিনের
অশ্বত্থের শিরীষের বকুলের

অন্ধকারে যৌবনের মতো মন্থরতা
নিস্তব্ধ আকাশ জুড়ে সমুদ্র গভীরে
জলচর প্রাণীদের আবিষ্ট ভ্রমণ
খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে
আমি কি তোমায়—

একটি কবিতা | পার্থ রাহা

অতিদূর নির্বাসনে হে আয়ুষ্মাণ
তোমায় স্মরণ করবো না।
ভালবাসার তিক্ত লোনা স্রোতে
খেলা ভাঙছি বলে, রূপসীর
ঘোমটা খসে যাবে।

অতিদূর নির্বাসনে হে আয়ুষ্মাণ
আমি আলোক চাইনা।
উৎসের প্রখর নির্জনেন
অবিশ্রান্ত উচ্চারণ থেকে
নষ্ট নক্ষত্রের নীচে
কোন ছায়াপথ নেই,
দৃশ্য-দৃষ্টির তরল ধ্বনিত সীমান্তে
কোন আবিষ্কার নেই।

সময়ের নিরুথানে হে আয়ুষ্মাণ
তোমায় স্মরণ করবো না।

গ্রীনিচ জিরো আওয়ার | সামসুল হক

দলবদ্ধ হ'য়ে থাকা প্রথা।
বিশেষ যখন সব বিষাক্ত তীরের মাপা রেঞ্জের ভিতর,
হৃদয়ের অন্তর্লীন আশার ভিতর,
বিশেষ যখন ভাষা বাথরুমে—কুমারী স্তনের অস্থিরতা।
তবু, ঠিক সকলেই ক'রে যাচ্ছি ফোকরের দারুন সন্ধান
দেয়ালের খাঁজে কিংবা চৌকাঠের বিঘৎ উপরে,
ব্যক্তিগত দুখুগুলো রেখে দিয়ে সেখানে, সটান
দলবদ্ধ হ'য়ে রাস্তা পার হ'তে যাবো:
সিগারেট বের কর—মেয়েটাকে ছাপ না মাইরি,
যেন, সাদা-মাটা লোক—মনে খেদ কিন্তু নেই বাবা।

মাঠের মাঝখানে বেশ পৌঁছে গেছি, আর
ভয় নেই, হাত নামা, একেকটা আস্ত জানোয়ার
(খুব হিংস্র হওয়া চাই) হয়ে কাউকে আক্রমন করি, যেমন পাহাড়
আমাদের দুখুগুলো আক্রমন করে,
যেমন গোঁপের নিচে নিজেদের শান্ত হাসি আমাদের আক্রমন করে
যেমন ফোকর থেকে কিলবিলিয়ে ঝরে পড়ে দুখুগুলে আক্রমন করে।
এখানেই আলো নিভে যায়,
মাঠ অন্ধকার,
সকলে সন্ত্রস্ত হ'য়ে বেসামাল, হাহাকার, শুধু হায় হায়,
কেন শ্লোক : মধুবাতা ঋতায়তে, কেন দল, দলীয় প্রথায়
ফুঃ মন্তর করে দিয়ে নিজেকে উড়িয়ে দেয়া যায় না কেন যো
শিকারের খোঁজে
নখের ত্রিশূল যেন খুঁজছে আত্মহননের চোখ।

ইস্রাফিল শিঙা ফুঁকছে, আঃ আঃ—
কান চামড়া নাক মুখ সব ফেটে গেল,

সূর্যের দূরত্ব মাত্র মাথার উপরে বারো হাত—
পৃথিবী আমার মতো টগবগিয়ে ফুটছে সারাদিন সারারাত,
'অতসী সতীশ' বলে একদিন ডাকাডাকি করলে
আনন্দের ফড়িং লাফাতো—
এখন আহ্বান শুদ্ধ হাস্যকর, 'হাস্যকর' শব্দটা এখন শূন্য, বেবাক বেপাত্তা ;
শিশু···সূর্য···শব্দ···ভাষা···মৃত্যু·····
অন্ধকার ঘর, শেলফে শূন্য শিশি, ব্রোমাইড নেই।

প্রবীনের পিছনে তাকানো মুহূর্তকে মনে করে | স্বদেশ রঞ্জন দত্ত

কে দেবে তোর হাতের মুঠোয় স্বর্গ ধরে।
দ্বারে দ্বারে ফুল ফোটাতে জল ছিটালি
ফুটলো না তো একটিও
আর বিনিময়ে বালকগুলির করতালি
কুড়িয়ে ঘর ভর্তি হলো।

ধিক্কারে ধিক্কারে গত বিশের রাখা
সাজানো সব ফুলের বাগান ধুলোয় মাখা।
একটিও ফুল পারেনি তার পাপড়িগুলি
ফুটিয়ে বন গন্ধে পাগল করে দিতে।
ভেবেছিলি বৈশাখী তার ভালোবাসায়
কৃষ্ণচূড়ায় বাগান আলো করে দেবে।

ভালোবাসা সেটা যেন কেমন বস্তু
বিষম লাগার মতই সেটা দমকা এসে
বুকের মধ্যে যন্ত্রণাকে গিয়ে রাগে :
তাও এলো না বয়সগুলির বেড়া টপকে।

শুধু খ্যাতির লোভে ক্লান্ত বয়সগুলি
বোবা হয়েই লুটিয়ে পড়ে রাঙা ধুলোয়।

যাবো না | সুদর্শন রায়চৌধুরী

যাবো না মা যাবো না আর কক্ষণো ;
দরজা বন্ধ হয়েছে তার এখন সে
একাই গাইবে শুনবে বোবা চার দেয়াল
ভালোই আছে, নেই কো কোন লক্ষণও
কপাল পোড়ার—এখন সে তো দুনিবার
নিজেই যাবে বনের পারে, মিথ্যে ভয় !
ফেরার হলে নিজে থেকেই ফিরতো সে
আমার কাছে ফেরার নেই কো স্বপ্ন তার।
যাবো না মা যাবো না আর, উচ্চতায়
লজ্জা হয় যে এখন আমি বালক নই,
তোমার কাছে বলতে কোন লজ্জা নেই—
আমার এখন গণ্ডী আছে স্বল্পতায়।

যাবো না মা যাবো না আর কক্ষণো,
বরং যাবো দিগ্বিদিক শূন্যতায়।

অচিহ্নিত | সুনীল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক খুশির ছায়া, অনেক শ্রান্ত রোদ
এই পথ দিয়ে হেঁটে গেছে ;
অনেক বৃষ্টি এসে পায়ের চিহ্ন যত
মুছে দিয়ে গেছে।
আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলাম।
মাটির প্রদীপ জেলে দুই হাতে ঢেকে
আলোর উত্তাপ যত
হৃদয়ে জড়িয়ে নিতে চাইছিলাম ;
আমার অনুভূতিগুলো ওই পথে,
কিংবা ওইরকম আরো অনেক পথে
ছায়া আর রোদে আর বৃষ্টির অজস্রতায়
হারিয়ে দিতে।

অনেক রোদের ছায়া শ্রান্ত হয়ে এই পথে এসে,
অনেক বৃষ্টির আশা এই পথে এসে
আমার দরজায় আঘাত করে গেছে।
আমি দরজা বন্ধ করে বসেছিলাম।
অন্ধকার শীতলতা হৃদয়ের আলো দুই হাতে ঢেকে
ওই পথে কিংবা ওইরকম আরো অনেক পথে
আমার অনুভূতিগুলো ফেরি করতে চেয়েছিল ;
কিন্তু আমি আমার সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে
আমার আজন্ম অনুভূতি কিংবা আমার হৃদয়
ছায়া আর রোদ আর বৃষ্টির অজস্রতায়
ছড়িয়ে দিতে পারিনি।

আত্মপ্রতিকৃতি | তুলসী মুখোপাধ্যায়

নিজেকে দেখার মতো অতিবড় অভিযান
অদ্যাবধি পৃথিবী চাক্ষুষ করেনি
নিজেকে চেনার মতো দ্বিতীয় যন্ত্রণা—কোনো
বেদ ও পুরাণে লেখা নেই
আত্মপ্রতিকৃতির মতো ভয়ঙ্কর ক্রুশকাঠি
কোনো দক্ষ মিস্ত্রীর হাতে এখনো আসেনি।

নিজেকে দেখতে গেলে
চশমার কাঁচ রোজ জীবাণুনাশকে ধোয়া লাগে
সকাল বিকাল রোজ বেড়াবার আগে
যাবতীয় চলাচল নিড়িয়ে দিতে হয়
নিজেকে চিনতে হলে
রৌদ্রের মতো সর্ব চরাচরগামী পোষাক চাপিয়ে
খাল-বিল কাঁটা ঝোপ শামুক-পর্বত
সমতল পায়ে দ্রুত হাঁটা প্রয়োজন।

কিছু কিছু জানাজানি হয়ে গেছে বলে
বসতবাড়ীর টব ফুলদানি টিয়াপাখি দেয়াল পঞ্জিকা
ধনুর্বাণ-শিরস্ত্রাণ ঘুরোনো সিঁড়ির পাশে ডায়েরীর প্রিয় সম্ভাষণ
ছুঁড়ে ফেলে ক্ষিপ্র দুহাতে—গেলাঘর ভেঙে গুড়ো করে
কতিপয় আশ্চর্য ডুবুরী চলে গেছে ভীষণ নীরবে।
বুক পকেটের খাপে নিজ নিজ ঠিকানা দেখে ফেলে
তারা আর নিজেদের মাচালে ফেরেনি।

নিজেকে দেখার মতো অদ্বিতীয় অভিযান
অদ্যাবধি পৃথিবী চাক্ষুষ করেনি।

সেই | আনন্দ বাগচী

রাতারাতি বদলে গেল আকাশ মাটি জল
স্বপ্ন গেল ভেঙে হাতে থাকলো না সম্বল।
তেমন করে চাঁদ ওঠে না মন-কেমনি হাওয়া,
রাঙা মেঘের আকাশপানে আর হলনা চাওয়া।

মেঘের 'পরে মেঘ জমে কি রঙের পরে রঙ?
রূপ কাহিনীর সিঁদরোজায় আজ ধরেছে জং।
আর কি তেমন বৃষ্টি পড়ে? চমকায় রোদ্দুর?
তেমন করে ডাক আসে কি পুরোনো বন্ধুর?

যতই মালা গাঁথি এবং কোকিলে কান পাতি
ঘরেও একা বাইরে একা, কেউ কোথা নেই সাথী!
হোঁচট লাগে, চমকে দেখি ঘরেরই চৌকাঠ
সাত সমুদ্দুর তের নদী তেপান্তরের মাঠ॥

গ্রহনযোগ্য | শংকর চট্টোপাধ্যায়

সবই গ্রহনীয় তবু কিছু কিছু নির্বাচন ভালো
সতর্কতা, উদ্দণ্ডবিষয়
শরীর পেয়েছ বলে ধরেছো গোলাপ

চিনে গেছ মাংস, ত্বক, জলের গর্জন
নিজেকেও আবিষ্কার ধূলির খেলায়।

হৃদয় বয়স্ক হলে জানা যাবে দিগন্ত নির্দেশ
নির্বাসন, মহামারী, মিথুনবিপ্লব
নতুন অঙ্কুরে তুমি অভ্যুদয় দেখেছিলে নাকি
কাঠখোদাইয়ের শিল্প, আবহ সঙ্গীত।
আত্মগোপনের কালে মর্ম ছিঁড়ে উড়েছে ফানুস
ঈশ্বর। ঈশ্বর।
শিখে রাখ নির্বাচন, অমর্ত বিচার।

আগুন | গৌরাঙ্গ ভৌমিক

ক্রমাগত জলতরঙ্গের ধ্বনি,
আবৃত ও অনাবৃত মুখ,
ফুলের মতো দীর্ঘশ্বাসের শব্দ—
সারাটি মাঠ, সারাটি পথ ছড়িয়েছিল।
আমি সমস্ত মাড়িয়ে,
সমস্ত ছড়িয়ে
ঘরে ফিরে এলাম।
সুলোচনা, আমি কি পাগলাঘন্টির আওয়াজ
শুনতে পেয়েছিলাম?
আমার ঘরে আগুন, কে নেবাবে?
শকুনের মতো লাল ঠোঁট বিদেশী দমকল
এখনও দূরে অপেক্ষমান।

প্রান্তরে শব্দ, দীর্ঘশ্বাস—ঘরে আগুন,
সুলোচনা, চার দেয়ালের সীমানায়
চতুর্ভুজ পৃথিবী
ধোঁয়ায় শব্দে পাগলা ঘন্টির আওয়াজে
ভয়ার্ত ঈশ্বরের জিভের মতো নড়ছে।

আমি সমস্ত মাড়িয়ে
সমস্ত ছড়িয়ে
ঘরে ফিরে এলাম।

মুখ | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যেন আমার ঘুমের মধ্যে ঝড় উঠলো
ঝড়ের মধ্যে ঘুমন্ত মুখ
মুখের মধ্যে ঘুমন্ত ঝড়
মুখ পেরিয়ে বুকের কাছে ঝড়ের মুখ
ঝড় পেরিয়ে বুকের কাছে অন্য মুখ
নরম দুই কোমল স্তনে অন্য ঝড় অন্য বুক;
ঝড় উঠল কোথায়?
আমি
তোমার বুকে ঢাকি আমার ঘুমন্ত মুখ।

সেই পাখি | রাম বসু

আমি কৃষ্ণচূড়ার দিকে আর তাকাই না
নিশীথ রাতের গন্ধের মতো স্মৃতি ঘিরে থাক
আকাশে যে পাখি চক্র দিয়ে ডাকছে দুপুরে
আমি তার কণ্ঠে অনেক নষ্ট কুসুমের কান্না শুনেছি
আমি জানি আলের পাশে মাথা রেখে ঘুমালে
সেই পাখি নেমে আসবে আমার বুকের কিনারে
আমাকে অনেক সমুদ্র অরণ্যের গল্প শোনাবে
সেই পাখি—।

আমি ঘুমিয়ে পড়লে সেই পাখি
আমাকে পরিচ্ছন্ন নির্জন হ্রদ ভেবে মুখ নামাবে
পূর্ণিমার চাঁদের মতো লতা পাতার ব্যূহের মধ্যে সেই মুখ

সেই মুখ পৃথিবীর ভুলে যাওয়া রূপ কথার মতো
আমাকে নিয়ে যাবে বিশ্ব থেকে অন্য বিশ্বে
নিশি-পাওয়ার মতো পরিনামহীনতায়
সেই পাখি।

বনভূমি হাওয়ার আড়ালে | সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

রুমালে অম্লান গন্ধ,
হাওয়ার আড়ালে সেই চিত্রময় দেহ,
বিস্মিত ক্ষুরের শব্দ।

না—এখানে থাকব, এখানে থাকব,
হাতীর পায়ের চাপে বৃত্তরেখা,
অনালোক দেশ।
তীক্ষ্ণ দাঁত ছিঁড়ে ফেলে নিরুদ্ধ বিস্ময়,
না—আমি এখানে থাকব,
শব্দময় বনভূমি,
গজদন্তে খচিত কৃপাণ,
শাণিত ও তীক্ষ্ণ মুখ,
নিয়ত অগ্নিস্নাত গোপন আকাশ,
আমি চিরদিন সেই অম্লান সুগন্ধ,
বিস্মিত ক্ষুরের শব্দ চিত্রময় দেহ আমি হাওয়ার আড়ালে।

সম্পাদকের কলম

প্রশংসনীয় উদ্যম

একটা মহৎ সঙ্কল্পকে বক্ষে ধারণ করে, সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতার জগৎ এক উত্তেজনাপূর্ণ ও প্রশংসিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আমরা সেই সম্ভাবনার পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি, ভবিষ্যতাগত কাব্যতরণীর গর্বিত বৈঠার আওয়াজও আমাদের কানে আসছে। সব মিলিয়ে আমরা

আশান্বিত এবং আনন্দিত। বাঙলাদেশে কবিতার দৈনিক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই ইতোমধ্যে বাঙলা কাব্য শাখাটিকে এক সুস্পষ্ট প্রগতি ও মহত্তর ভাবনাসূত্রে চিহ্নিত করবার দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীর কোনো দেশে কেউ কবিতার প্রচারে ও প্রসারে এত কম সামর্থ নিয়ে (শুধু উদ্যম ও ঐকান্তিকতা সম্বল করে) এমন দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। বাঙলা দেশ এদিক থেকে কবিতার প্রতি তার গভীর আনুগত্যই জানিয়েছে। এইসব প্রচেষ্টা আয়োজনের দিক থেকে যেমন অভিনব, প্রয়োজনের দিক থেকেও তেমনি অচিন্তিতপূর্ব। কবিতা মানুষকে ধন দেয় না, বিত্ত দেয় না—কিন্তু চিত্তের ঔদার্য দান করে। কবিপ্রাণের সুখদুঃখের সোনালী ফসল কবিতার আকারে মুক্তোর মতো জলজল করে। সেই ফসল রাখবার ঠাঁই চাই, সেই ফসল ফলাবার উৎসাহ চাই—বাঙলাদেশের কবিতা পাগলেরা সঙ্কীর্ণ সামর্থ দিয়ে সে অভাব পূরণ করতে চলেছেন। এই অর্থ ও রক্তক্ষয়ী উদ্যমের জন্য তাঁরা উত্তরসূরীদের কাছ থেকে চিরদিন সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দনে অভিষিক্ত হবেন।

একটি শ্লোগানের জন্য

মানুষ নেশা করে নানা কারণে—কেউ বা অতীতকে ভোলবার জন্য, কেউ বা দুর্বিসহ বর্তমানকে—কেউ বা সাময়িক উত্তেজনার প্রয়োজনে। কেউ ধূমপান করে, কেউ বা তরল পানীয়। আকারে প্রকারে কঠিন বা তরল—যাই হোক না কেন—উভয়েই প্রয়োজন সিদ্ধির বাহক। আমরা প্রয়োজনের তাগিদে কবিতার আরক পান করতে চাই—তবে অতীত-বর্তমানকে ভোলবার জন্যে নয়, ভবিষ্যতকে দৃঢ়তর করবার জন্যে—আমরা কবিতাকে ভালবাসব—আর সব নেশাকে ভুলব। কবিতা আমাদের প্রাণের সম্পদ হোক—উদ্দীপক হোক—আমরা কবিতার প্রেমে অন্য কবিকে ঈর্ষা করতে চাই—পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বীর আসনে বসিয়ে আমরা দ্বিতীয় সমাজ গড়ব—কবিতার সমাজ গড়ব।

এই মনোভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে সম্প্রতি প্রকাশিত কবিতার পাক্ষিক "বাঙলা কবিতা"র প্রথম সম্বলনে। শ্লোগান অনেকগুলি মানুষের সম্মিলিত ইচ্ছার বাহ্যিক যোগফল। অনেকের কণ্ঠে এই সঙ্কল্প ঘোষিত হলে

উক্ত শ্লোগানের গভীরতর দীপ্তিতে আমরা নিজেদের উপলব্ধি করতে পারব এবং পরস্পরকে আত্মীয়ের মতো চিনতে পারব—শত্রুর মত নিবিড় করে বুঝতে পারব।

কবি ও কবিগোষ্ঠী

আধুনিক কবির পদযাত্রা সমাজ ও প্রান্তরের বুক চিরে আত্মীয়-অনাত্মীয় জনতার মধ্য দিয়ে অচেনা ভবিষ্যতের দিকে। অপ্রাপ্তি ও সংশয়ের বেদনা কবিকে অভিযাত্রীর শক্তি দান করে দ্বিতীয় ভুবনের সন্ধানে নিয়োজিত করে। বর্তমানটা কোনকালেই পরিচ্ছন্ন ছিল না, অথচ কবির প্রত্যাশা সেই ছিমছাম ভবিষ্যতের দিকে,—প্রতিটি বিবেকবান সহৃদয় মানুষও সেই প্রসন্নতম ভবিষ্যতেরই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে থাকেন।

কবির ইচ্ছা কবিতার মুখে উচ্চারিত হয়। ফলতঃ কবিকেও কাগজ, সম্পাদক, প্রচার ও প্রচার-যন্ত্র প্রভৃতি জাগতিক স্থূল বৃত্তগুলির চারপাশে আনাগোনা করতে হয় এবং মাঝে মাঝে ঘুর্ণিনৃত্যের অনুশীলন করতে হয়। প্রায়শঃ দেখা যায়, কখনও বিশেষ মতাদর্শের প্রচারে অনেকগুলি নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের একত্র সমাবেশ ছায়াপথ বা ছায়াবৃত্তের সৃষ্টি করে। বাঙলা কাব্যাকাশে এরূপ সমাবেশ একাধিকবার লক্ষ্য করা গেছে, বর্তমানে সংখ্যা গণনায় সেরূপ সমাবেশ প্রাক্তন সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করে স্বদেশের দেয়াল ঘেষে ঠেলাঠেলি করছে। আশা ও আকাঙ্ক্ষার সংগে আমরা এই প্রকার বহু কাব্যিক জনতার উত্তেজনা প্রত্যক্ষ করেছি। কবিতার little magazine-গুলো প্রকাশিত হয় এই উত্তেজনার যোগাযোগে এবং বিনষ্ট হয় পরস্পরের ক্রুদ্ধ কপালের ঠোকাঠুকিতে। যদি আমরা বহুঘোষিত নির্জনতায় নিষাদ হতে পারতাম, তাহলে বোধহয়, অশুভ পরিণতিকে রুখবার শক্তিও পেতাম।

সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতার ঊর্ধাকাশে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ও ছায়াপথ—সবই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ পুরোপুরি একটি অ-সূর্য সৌরমণ্ডলের অস্তিত্ব অনুভববেদ্য হয়ে উঠেছে। দূরাগত দর্শকের দূরবীণে দৃশ্যটা প্রসন্ন ও উপভোগ্য। কেবল যাঁরা কাছের লোক, তাঁরাই আবহাওয়ার ঘনিষ্ঠতায় মুখ গোমরা করে আছেন। নিঃশ্বাসের সঙ্গে কিছুতেই সহজ হাওয়ার নম্রতাকে বুক ভরে টেনে নিতে পারছেন না। বস্তুতঃ কাছে থাকলে মানুষমাত্রই মোহাবিষ্ট না হয়ে পারে না এবং এই মোহ থেকেই ক্রমে মোহভঙ্গের যন্ত্রণাময়

ক্লান্তি দেহ মনে সঞ্চারিত হয়। কেননা, যন্ত্রণা সংশয়ের দ্বারা মানুষের মনকে চিরদিন বিচলিত ব্যথিত করে।

বাঙলাদেশে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকটি শক্তিশালী সাময়িকপত্র আছে—যাঁরা সাহিত্যের বাণিজ্য করেন এবং কবিদের আশ্রয়দাতা রূপে প্রায়শঃ প্রশংসিত। এবং কবিরা দৈহিক-মানসিক সামর্থের জোরে সেই আশ্রয়ের জঠরে পার্থিব সুখের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। ভীড় যেখানে বেশী—ঠেলাঠেলি ও গুঞ্জন সেখানে অধিক হবারই সমূহ সম্ভাবনা। ফলতঃ প্রতিযোগিতা ও তোষামোদের ঘর্মাক্ত হাওয়ায় কাব্য সাহিত্যের দরবারী হাওয়াটা কিছুটা আর্দ্র না হয়ে পারে না। কবিমাত্রই দরবারী স্বীকৃতির প্রত্যাশী। ব্যাপারটা আজকের নয়—আদ্যিকালের। আমরা হাজার বছরেও সেই সংস্কারের জামাটা মন থেকে ছিঁড়ে ফেলতে পারিনি। সাময়িকপত্রের হট্টরোলে কবির কণ্ঠস্বর কি কারণে সংযোজিত ও উচ্চারিত হয়ে থাকে—তা শিশুপাঠ্য গ্রন্থের প্রথম পড়ুয়ারও হয়তো অনুমানসাধ্য। আমরা এই প্রবনতার দুটো কারণ অনুমান করতে পারি—(১) অনেক পাঠকের কাছে কবির বক্তব্য প্রচারের সুলভ প্রলোভন (২) জাগতিক উন্নতির ও আর্থিক সমস্যার সবিশেষ সুরাহার দুরন্ত আকর্ষণ। ফলতঃ সম্পাদকরাও ভীড়ের মধ্যে নির্ভুল রায় দিতে পারেন না—কবির মুখ দেখে কবিকে চিনতে হয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, কাব্য, সাহিত্য, প্রবন্ধ নিবন্ধ, সমালোচনা, জন্ম ও মৃত্যু সংবাদ প্রভৃতি নানা বিষয় এক আশ্চর্য কাগজের সমুদ্রে নানা আকারের নৌকার মতো ভাসতে ভাসতে পাঠকের জনাকীর্ণ হাটে গিয়ে পৌছায়। যাঁরা হট্টগোল পছন্দ করেন না—তাদের বড় দুর্দশা। শেষ ক'বছর বাদ দিলে জীবনানন্দের জীবনটা নাকি সেই হট্টগোলীয় উপেক্ষার চরম সাক্ষী হয়ে আছে।

আঘাতটা সেখান থেকে আসে না—আসে ক্ষুদে মানুষগুলোর বিনীত অহঙ্কারের গর্ভ থেকে—তাঁরা কবিতার আলোচনা করেন—নিজের কথা অপরকে শোনান—কিন্তু অপরের কথা সহজে শোনবার জন্য দরজা জানালা খোলা রাখেন না। তাঁদের চারপাশে একটা অদৃশ্য ইলাষ্টিকের দেয়াল—ঠেললে কিংবা টানলে তা বাড়ে বা কমে—কিন্তু কিছুতেই বহিরাগতকে সহজে ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেয় না। ফলতঃ একের সঙ্গে অপরের মানসিক ব্যবধানটা কিছুতেই ঘুচতে চায় না। যদি কোনো সময়

তেমন দিন আসে—তাহলে বাঙলা কবিতার জগৎটা নতুন মানুষের হাসিগল্প চোখের জলে বিচিত্র হয়ে উঠবে। যদি দেয়ালগুলি ভেঙে যায়—তা হলে দেখব, আমরা একটা বিস্তীর্ণ হল ঘরে দাঁড়িয়ে আছি—আর বুঝতে পারব, আমরা পরস্পরের কত নিকট আত্মীয়!

কিন্তু আমরা সেই দেয়ালগুলি কোনোদিন ভাঙতে পারব কি?

মগ্ন বেলাভূমি : মৃণাল বসুচৌধুরীর কাব্যগ্রন্থ

সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতার টেবিলে মৃণাল বসুচৌধুরী একটি পরিচিত নাম। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "মগ্ন বেলাভূমি" নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য কবিপ্রাণের সহজ স্বচ্ছন্দ প্রকাশে এই কাব্যের কবিতাগুলি উজ্জ্বল ও সাবলীল। মৃণালের যন্ত্রণা সহজ বিশ্বাসের উৎসকেন্দ্র থেকে একটি স্বচ্ছ দর্পণের ভেতর দিয়ে সরাসরি পাঠক-মনে প্রতিফলিত হয়। কোনপ্রকার কৃত্রিমতা বা স্বেচ্ছাকৃত জটিলতা তাঁর কাব্যে নেই। অথচ যুগ যেখানে জটিল সেখানে সকল যন্ত্রণাকে সহজভাবে গ্রহণ করা অল্প শক্তির কাজ নয়। বর্তমানের হাওয়াটাই যেখানে রুক্ষ ও অপ্রসন্ন—সেখানে দাঁড়িয়ে মৃণাল অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের বন্ধুদের নাম ধরে ডাকছেন। এই চেনাকণ্ঠের আহ্বানে আমরা মৃণালের দিকে বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে না তাকিয়ে পারিনি। আমাদের বিশ্বাস, এই আন্তরিকতার শক্তিতেই মৃণাল শুদ্ধতম কাব্যপ্রেরণার উৎসকেন্দ্রের সন্ধান পাবেন।

সুদর্শন রায়চৌধুরীর কবিতা

কবি হিসেবে সুদর্শন এখনো কবিতার চণ্ডীমণ্ডপে আসর জমিয়ে বসেননি কিংবা সম্পাদকের টেবিলের পাশাপাশি কোথাও আড্ডা জমাবার জন্য মুরুব্বির সন্ধানে ঘোরাঘুরি সুরু করেন নি। এখনও শুদ্ধ যুক্তি ও আবেগের প্রেরণায় তিনি কাব্যরচনা করেন। সকলপ্রকার সুলভ সাময়িকতার প্রতি এই কবি বীতস্পৃহ। তাঁর কিছু কিছু কবিতা আমরা কোনো কোনো সাময়িকপত্রে লক্ষ্য করেছি। আমাদের বিশ্বাস, তাঁর কবিতা একদিন কাব্য পাঠককে চিন্তিত, সচকিত ও স্পৃহ করবে। কেননা, সর্বপ্রকার উত্তেজনা ও প্রলোভনকে কবি জয় করতে পেরেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "অকাল পউষ" শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা কবিতার আসরে আর একজন সহৃদয় বন্ধুকে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দবোধ করছি।

কাল সুবহ্ হোনেকে পহলে : শলোভের কাব্যগ্রন্থ

শলোভ হিন্দীসাহিত্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি। সার্থক রূপ ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে তাঁর কাব্য উজ্জ্বল। আধুনিক নগর জীবন, প্রেম ও নৈরাশ্য জীবন ও যৌবন, যন্ত্রণা ও প্রত্যয়বোধের অনুষঙ্গ রূপে তাঁর কবিপ্রাণে সঞ্চারিত। কখনও কখনও তাঁর কাব্যে প্রবৃত্তি এনেছে মানব জীবনের নিগূঢ়তম যন্ত্রণা ও প্রশান্তির বাহকরূপে। সনাতন ভারতীয় আদর্শের করে তীক্ষ্ণ, বর্তমানের প্রতিই কবির আগ্রহ অধিক। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কাল সুবহ্ হোনেকে পহলে উক্ত মনোভাবের প্রতিফলনে তীক্ষ্ণ ও আমরা কবির উন্নততর কাব্য সম্ভাহের জন্য অপেক্ষা করে আছি।

কবি-মেলা : একটি অভিনব প্রচেষ্টা

দেবকুমার বসু একদা বাঙলাদেশে কবিতামেলা করেছিলেন। আধুনিক কবিতার প্রচারে প্রসারে তার প্রচেষ্টার প্রশংসা না করে পারা যায় না। পঞ্চাশ ও ষাটের কবিদের কাছে তিনি একান্ত আপনজন ও আত্মীয়স্বরূপ। এখন কবিতামেলা নেই, কবি-মেলা তারই বিকল্প।

কবিমেলা কোনো সুনির্দিষ্ট আইনসম্মত পদ্ধতিতে গঠিত সংগঠন নয়। দলমত নির্বিশেষে যে কোনো কবি এই মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন—বিনা কৈফিয়তে সকল সংশ্রব ত্যাগ করতে পারেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য মুক্ত পরিবেশে কবিতাপাঠ, আলোচনা, বিতর্ক ও অনুশীলনের সহজক্ষেত্রে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে উপলব্ধি করা এবং কবিতার পরিবেশকে দ্রুত ও মধুর করে তোলা। বাঙলাদেশে মুক্তাঙ্গন থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কবিমেলার অলিখিত উদ্দেশ্য অনেকটা অনুরূপ। আমরা দেবকুমার বসুর এই নতুন উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

কবিতার পাঠাগার : একটি আকাঙ্ক্ষিত উদ্যম

'শান্তি লাহিড়ী, স্বদেশরঞ্জন দত্ত প্রভৃতির উদ্যোগে আধুনিক বাঙলা কবিতার একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাঙলা কবিতার গতি প্রকৃতির বিচার বিশ্লেষণ, কবিতার অনুশীলন, মনন ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে এই পাঠাগার বহুদিনের একটি অভাব পূরণ করতে চলেছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন কবি ও কবিতা অনুরাগীদের কাছ থেকে বহু বই পাওয়া গেছে। আরও বই প্রয়োজন। কবি ও কবিতা পাঠকরা তাঁদের মূল্যবান সংগ্রহ থেকে কিছু দান করলে আমরা আনন্দিত হব। প্রতি রবিবার সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত যে কেউ "লেক-স্টেডিয়াম" ব্লক ২ রুম ৬—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। পার্শেল বা রেজিষ্ট্রী পাঠাবার ঠিকানা—বাংলা কবিতা। ১৮ পদ্মপুকুর রোড কলকাতা ২০।

এম, এ, পরীক্ষার্থীদের জন্য কয়েকটি অপরিহার্য গ্রন্থ

সাহিত্য সরণী। গৌরাঙ্গ ভৌমিক রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

(হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উচ্চ-প্রসংশিত)

আলোচ্য বিষয়ঃ (১) বাঙলা সাহিত্যের উপক্রমণিকা, (২) বাঙলা সাহিত্য ও হিন্দু বৌদ্ধযুগ, (৩) চর্যাপদ, (৪) জয়দেব : বাঙালির কবি, (৫) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, (৬) বাইশ কবির মনসামঙ্গল, (৭) গোপীচন্দ্রের গান। আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে প্রাবন্ধিক সম্ভাব্য সমস্ত দিক সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। অরুণিমা পাবলিশার্স ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ দ্বয় প্রকাশিত।

সারদা মঙ্গল : বিহারীলাল চক্রবর্তী। গৌরাঙ্গ ভৌমিক সম্পাদিত

ভূমিকায় বিহারীলালের জীবন, পরিবেশ, মানসিকতা, রোমান্টিক কাব্যের সূত্রপাত, লিরিক কাব্যের ধারায় তাঁর স্থান আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া সারদা মঙ্গলের কথা-বস্তু, উনবিংশ শতাব্দীর মানসিকতা, রোম্যান্টি সিজমের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ, মিষ্টিসিজম, বিহারীলালের সারদার স্বরূপ, বিহারীলালের কবিসামর্থ, পরবর্তী কাব্যে প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি নিপুনতার সঙ্গে সম্পাদক বিশ্লেষণ করেছেন। বোর্ড বাঁধাই. সুদৃশ্য প্রচ্ছদ। দাম : ছটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অভিসার : ঘরে-বাইরে। রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

(ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সহ)

উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উচ্চ প্রসংশিত

দেশী-বিদেশী রোম্যান্টিক কবি ও কাব্যের ওপর বিদগ্ধ আলোচনার গ্রন্থ। বাঙলা ভাষায় এজাতীয় বই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। দাম : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। পরিবেশনী ৯৩, সিমলা স্ট্রীট, কলকাতা-৬ কর্তৃক প্রকাশিত।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা। গৌরাঙ্গ ভৌমিক

রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ, চতুরঙ্গ, জীবন স্মৃতি, ছিন্নপত্র প্রভৃতি গ্রন্থের ওপর সুদীর্ঘ আলোচনার গ্রন্থ। ছাত্র, অধ্যাপক, পাঠাগারের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। দাম : চার টাকা।

পাণ্ডুলিপি প্রকাশন ২৯এ কালী দত্ত স্ট্রীট কলকাতা ৫

পরিবেশক ঃ অ্যাকাডেমিকা ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-১২

শ্রীসনৎকুমার ব্যানার্জী কর্তৃক স্বস্তিক মুদ্রণালয় ২৭/১বি বিধান সরণী হইতে মুদ্রিত।
মূল্য ৩০ পয়সা

এফ, আহমেদ অ্যাণ্ড কোং
ডায়ার্স অ্যাণ্ড ড্রাইক্লিনার্স

★

সকল প্রকার গরম ও সূতী কাপড়ের রং, রিপু, ও ধোলাইয়ের শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

★

১১এ. সূর্য সেন ষ্ট্রীট কলকাতা ১২
ফোন : ৩৪-৬৬০২

শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত নতুন কবিতা সাপ্তাহিক

সাপ্তাহিক বাঙলা কবিতা

নিয়মিত পড়ুন

১৩।১ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট কলকাতা-১২

[কবিতা সাপ্তাহিকীর সঙ্গে শক্তি সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন]

★

দেবকুমার বসু সম্পাদিত

রণন

আবার প্রকাশিত হচ্ছে।

★

নতুন গল্প। সম্পাদক তুষারাভ রায়চৌধুরী

নিয়মিত পড়ছেন কি ?

★

কৃত্তিবাস নতুন সংখ্যা বেরিয়েছে।

অকাল পউষ। সুদর্শন রায়চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থ। যন্ত্রস্থ

★

সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তৃষ্ণা, আমার তরী। সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো। শক্তি চট্টোপাধ্যায়

এই দশক : তিনজন { পার্থ রাহা, মৃনাল বসু চৌধুরী, রথীন ঘোষ

শংকর দে-র আসন্ন প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

স্বপ্নের মধ্যে চিৎপুর ফায়ার অ্যালার্ম

সিগনেট বুক সপ ও অন্যত্র পাওয়া যায়

EDITOR : GOURANGA BHOWMIK
Published by Jayantkumar for Pandulipi Prakashan 29A Kali Dutta Street,
Calcutta-5 Phone : 55-9040